ট্রুথলাভ অ্যান্ড আ লিটল ম্যালিস

খুশবন্ত সিং

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে খুশবন্ত সিং সুপরিচিত এবং লেখক হিসেবে অত্যন্ত সমাদৃত। তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলে আর থেমে থাকার উপায় থাকে না। পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে তিনি একটানা লিখে যাচ্ছেন। লেখক, সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর প্ররোচনামূলক ও বিতর্কিত। কিন্তু লেখা গভীর চেতনায় সমৃদ্ধ এবং আবেদনপূর্ণ। সর্বোপরি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি সততা থেকে বিচ্যুত হননি এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, পাঠকদের কখনো বঞ্চিত করেননি। তাঁর আত্মজীবনী আসলে তাঁর জীবন ও কাজের ওপর লেখা একটি বিবরণ।

১৯১৫ সালে বিভাজন-পূর্ব পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণকারী খুশবন্ত সিং আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অধিকাংশ প্রধান ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। উপমহাদেশের বিভক্তি ও স্বাধীনতা থেকে শুরু করে ভারতের জরুরি অবস্থা, স্বর্ণমন্দিরে উগ্র শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন ব্লু স্টার' এবং তার পরিণতি দেখেছেন খুব কাছে থেকে। ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত বহু নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তিনি জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধীর মতো নেতা, সন্ত্রাসী জর্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে, মেধাবী ও কেলেঙ্কারি সৃষ্টিকারী চিত্রশিল্পী অমৃতা শেরগিল এবং উপমহাদেশের বিভক্তির সময় কসাইয়ে পরিণত মানুষদের সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত স্বচ্ছতা ও অকপটতায়। নিজের জীবন সম্পর্কেও খুশবন্ত সিং অবিচলিত স্পষ্টতায় লিখেছেন। আইনজীবী, সাংবাদিক, লেখক এবং পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে পেশাগত সাফল্য ও ব্যর্থতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ষাট বছরের বেশি সময়ের দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও হতাশার কথা বলেছেন। রাজনীতি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অজানা সত্য তুলে ধরায় সংশ্লিষ্টরা যে ক্ষুব্ধ হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ক্ষোভের শিকারে পরিণত হয়েছিল তাঁর আত্মজীবনী 'ট্রুথ লাভ অ্যান্ড আ লিটল ম্যালিস'। তা না হলে এটি প্রকাশিত হতো ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে। গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখার আগে এর একটি অংশ এক সাময়িকীতে প্রকাশ পাওয়ার পর ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ মানেকা গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ তুলে খুশবন্ত সিং ও তাঁর প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা

করেন। মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হওয়ার পর গ্রন্থটি গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। ওই সময় আমি 'টাটা এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এর' এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে দিল্লিতে অবস্থান করছিলাম। এ কারণে প্রকাশের সাথে সাথেই গ্রন্থটি সংগ্রহ এবং খুশবন্ত সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সুযোগ ঘটে। এ গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকদের কাছে আরো আগে তুলে দেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু দিল্লি থেকে দেশে ফিরে আসার পরদিনই (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২) আম্মা ইন্তেকাল করেন। স্বাভাবিক কারণেই এটির অনুবাদে হাত দিতে বিলম্ব হয়েছে। তবু যথাশীঘ্র অনুবাদ শেষ করতে পেরে পরিতৃপ্তি বোধ করেছি। ২০০২ সালের শেষ দিকে 'ঐতিহ্য' এ আত্মজীবনী প্রকাশ করে। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে খুশবন্ত সিং মৃত্যুবরণ করার পর পাঠকের মাঝে তাঁর আত্মজীবনী পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। খুশবন্ত সিং তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে আর কোনো উপন্যাস লেখা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রচণ্ড জীবনীশক্তির অধিকারী। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বারিয়্যাল অ্যাট সি' এবং ২০১০ সালে তাঁর বয়স যখন ৯৫ বছর, তখন তাঁর শেষ উপন্যাস 'দ্য সানসেট ক্লাব' এবং ২০১২ সালে ৯৭ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তার জীবনের বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতার মূল্যবান সংকলন 'খুশবন্তনামা : দ্য লেসনস অফ মাই লাইফ'। আমি এই গ্রন্থগুলোও অনুবাদ করেছি। খুশবন্ত সিংয়ের সব গ্রন্থের মতো তাঁর আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। 'ঐতিহ্য'র উদ্যোগ তাঁকে আরো ব্যাপকভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক

সূচিপত্র

আত্মজীবনী লেখার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ১১
মরুভূমির মাঝে গ্রাম ১৪
শৈশব থেকে কৈশোর : স্কুলের বছরগুলো ২৩
দিল্লি ও লাহোরে কলেজের দিনগুলো ৪৪
ইংল্যান্ডের জীবন ৭০
লাহোর, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা ১০৬
লন্ডনে মেনন এবং কানাডায় মালিকের সাথে ১৩৬
অতীত থেকে মুক্তি এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন ১৭৪
প্যারিসের দিনগুলো ১৮৫
ভারত সন্ধানে ২১৩
শিখ ধর্ম ও ইতিহাস ২২৭
বোম্বে, দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি
অব ইন্ডিয়া এবং অতঃপর ২৪৯
গান্ধী ও আনন্দ পরিবারের সঙ্গে ৩০০
১৯৮০-৮৬, পার্লামেন্ট এবং হিন্দুস্থান টাইমস ৩২২
পাকিস্তান ৩৬৯
অবাঞ্ছিত লোকদের সঙ্গে ৩৮৩
সর্বশক্তিমানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ৩৯৪
লেখা এবং লেখকবিষয়ক ৪০৯
উপসংহার এবং একটি অধ্যায় ৪৩০
শেষ অধ্যায় ৪৪১

আত্মজীবনী লেখার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

কিছুটা ভীতিপূর্ণ চাঞ্চল্য নিয়ে আমি এই আত্মজীবনী শুরু করেছি। এটি অনিবার্যভাবেই হবে আমার শেষ বই। আমার জীবনসন্ধ্যায় লিখিত অন্তিম রচনা। আমার লেখার কালি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আরেকটি উপন্যাস লেখার মতো মানসিক শক্তি আমার নেই। অনেকগুলো ছোটগল্প অর্ধেক লেখা অবস্থায় পড়ে আছে এবং সেগুলো শেষ করার মতো শক্তি আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আমার বয়স সাতাশি বছর। প্রতিদিন আমি অনুভব করি যে বার্ধক্য আমার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। আমার যে স্মৃতিশক্তি নিয়ে একসময় আমি খুব গর্বিত ছিলাম, তা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এমন এক সময় ছিল, যখন টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখার তোয়াক্কা না করেই দিল্লি, লন্ডন, প্যারিস ও নিউইয়র্কে আমার পুরোনো বন্ধুদের ফোন করতাম। এখন আমি প্রায়ই নিজের টেলিফোন নম্বর ভুলে যাই। শিগগির হয়তো আমার মধ্যে একধরনের ভীমরতি জাগবে এবং ফোনে নিজেকেই পেতে চেষ্টা করব। আমার দুচোখেই ছানি পড়তে শুরু করেছে, সাইনাসজনিত মাথাব্যথায় ভুগি, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের কিছু সমস্যাও আছে। আমার প্রোস্টেটও বেড়ে গেছে, যার ফলে কখনো কখনো ভোরের দিকে যৌবনের ভ্রান্তি শরীরে ভর করে প্রচণ্ড উত্তেজনাজনিত উত্থিতাবস্থার আকারে। আবার অনেক সময় প্রস্রাবের বেগ এত প্রবল হয় যে আমি সালোয়ারের ফিতা খোলার সুযোগও পাই না। শিগগির আমাকের অপারেশন করে প্রোস্টেট ফেলে দিতে হবে। এটি থাকলে ভুয়া যৌন উন্মাদনা ও যৌবনের তাড়না আমার ওপর ভর করতেই থাকবে। প্রায় দুই দশক ধরে আমি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর হিট লিস্টে ছিলাম। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমার বাড়ি পাহারা দিয়েছে সৈন্যরা এবং যেখানেই আমি গেছি, সেখানেই তিনজন সশস্ত্র প্রহরী পালাক্রমে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত—টেনিস খেলা, সাঁতার কাটা ও হাঁটার সময় এবং পার্টিতে। আমার

মনে হয় না যে সন্ত্রাসীরা আমাকে নাগালের মধ্যে পাবে। কিন্তু তারা যদি আমাকে পায়, তাহলে আমি তাদের ধন্যবাদ দেব বার্ধক্যের দুর্বিষহ অবস্থা এবং বেড প্যানে পায়খানা করা ও নার্সদের দ্বারা আমার পশ্চাদ্দেশ পরিষ্কার করে দেওয়ার অমর্যাদাকর পরিস্থিতি থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমার বাবা-মা দুজনই দীর্ঘজীবী ছিলেন। আমার বাবা মৃত্যুবরণ করেন নব্বই বছর বয়সে—স্কচ হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দেওয়ার কয়েক মিনিট পর। আট বছর পর আমার মা তাকে অনুসরণ করেন চুরানব্বই বছর বয়সে। তার অন্তিম অনুরোধ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ এবং প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—'ভিস্কি'। তাকে হুইস্কি দেওয়া হয়। তিনি গ্লাসটি ছুড়ে ফেলেন এবং আর কথা বলেননি। আশা করি, যখন আমার সময় আসবে, আমিও দীর্ঘ পথ যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে পান করার জন্য গ্লাস তুলে ধরতে সক্ষম হব।

স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করে আমি নিজেকে আরো চার-পাঁচ বছর সময় দিয়েছি সৃজনশীল কাজের জন্য। অতীতের যা কিছু স্মরণ আছে, তা সংগ্রহ করতে সে সময়কে কাজে লাগিয়েছি। নিজের অতীতকে আমি কখনো কারো কাছে প্রকাশ করিনি। উর্দু কবি হাকিম মাখমুর যেমন লিখেছেন :

আমি কাউকে আমার জীবনের কাহিনি বলিনি
কারণ, এটি নিয়েই আমাকে কাটাতে হবে
আমি তা-ই কাটাচ্ছি।

কোনো রকম লাজলজ্জা ও অনুতাপ ছাড়াই আমি নিজেকে প্রকাশ করি। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন :

মৃত্যুর পর ও মৃতদেহ পচে যাওয়ার সাথে সাথে
তুমি যদি বিস্মৃত না হতে চাও
তাহলে হয় পাঠযোগ্য কিছু লিখো
অথবা লেখার মতো কিছু করো।

আমি এমন কিছু করিনি, যার ফলে কেউ তা লিপিবদ্ধ করার মতো মূল্যবান বিবেচনা করতে পারে। আমি মরে পচে গেলে আমাকে বিস্মৃত না হওয়ার একমাত্র সুযোগ হতে পারে পাঠ করার জন্য মূল্যবান কিছু রেখে যাওয়া। বহু ঐতিহাসিক ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং সেই সব ঘটনাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। বিখ্যাত লোকদের

প্রতি আমি বিমুগ্ধ নই। যে সামান্য কজনকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে তাদের পা কর্দমলিপ্ত : তারা ছলনাকারী, ভুয়া, মিথ্যুক এবং একেবারেই সাধারণ মাপের।

শব্দের কারিগর হিসেবে ভান করার প্রবণতা আমার নেই। গত পাঁচ দশক ধরে লেখা দেওয়ার শেষ সময়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার পর কোনো অনুপ্রেরণার জন্য প্রতীক্ষার সময় আমার নেই। রসিকতামূলক বাগ্‌বিধি বাছাই অথবা যা লিখেছি, তা আরো গোছানোর সুযোগ নেই। ভালো গদ্য লেখার যা কিছু জানা ছিল, তা হারিয়ে ফেলেছি। এই আত্মজীবনী বয়োবৃদ্ধের সন্তানের মতো। এটি থেকে বেশি কিছু আশা করা যথার্থ হবে না। এর মধ্যে আছে কিছু গালগল্প, কিছু সুড়সুড়ি, কিছু খ্যাতি নাশ, কিছু বিনোদনের চাইতে উত্তম আর কী দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব।

আমার কন্যা মালা দয়াল, যাকে আমি বইটি উৎসর্গ করেছি, সে আমাকে পীড়াপীড়ি করেছে এটি লিখতে। আমার লেখা শেষ করার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে আমাকে সে যেভাবে জবরদস্তি করেছে, সে জন্য অনুতাপ করার ভালো কারণ হতে পারে তার জন্য। আমার ভাগনি গীতাঞ্জলি চান্দার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ যে মাইক্রোসফটে বহুবার টাইপ করেছে, বিবরণে ত্রুটি নির্দেশ এবং প্রায়ই নিজে সংশোধন করে দিয়েছে।

মরুভূমির মাঝে গ্রাম

সূচনার সঙ্গে শুরু করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছি, তা আমাকে বলেছেন যারা আমার জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন। কখন আমার জন্ম হয়েছে, তা অনুমাননির্ভরই রয়ে গেছে। আমাকে বলা হয়েছে, ঝিলাম নদী থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং খেওড়া লবণক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে প্রায় একই দূরত্বে থর মরুভূমির বালিরাশির মাঝে ছোট্ট জনপদ হাদালিতে আমার জন্ম। হাদালি এখন পাকিস্তানের গভীর অংশে। আমার জন্মের সময় আমার পিতা শোভা সিং তার পিতা সুজন সিংয়ের সঙ্গে দিল্লিতে ছিলেন। তার কাছে যখন খবর পাঠানো হয়, তখন তিনি ডায়েরিতে টুকে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। আমি তার দ্বিতীয় পুত্র। সে সময় আমাদের গ্রামে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা হতো না। হিন্দুরা যেভাবে তাদের সন্তানদের জন্মের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখে, যাতে তাদের কোষ্ঠীনামা নিরূপণ করা যায়, আমাদের শিখদের সে রকম জ্যোতিষবিদ্যায় কোনো বিশ্বাস নেই। সে কারণে জন্মের ক্ষণ ও স্থানের কোনো গুরুত্ব নেই। বেশ কয়েক বছর পর যখন দিল্লির মডার্ন স্কুলে তাকে আমাদের ভর্তির ফরম পূরণ করতে হলো, তখন তিনি আমার বড় ভাই ও আমার জন্মতারিখ লিখে দেন তার অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আমার জন্মতারিখ লেখা হয় ১৯১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। আরো পরে আমার দাদিমা আমাকে বলেন, আমার জন্ম হয়েছে ভাদ্র মাসে, যা আগস্ট মাসে পড়ে। আমি মাসের মাঝামাঝি ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট আমার জন্মতারিখ স্থির করি, যার ফলে নিজেকে পরিণত করি সিংহ রাশির জাতক হিসেবে। ত্রিশ বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিবসে পরিণত হয়। মায়ের দুধ ছাড়ার কিছুদিন পর আমার বাবা হাদালিতে আসেন আমার মা ও বড় ভাইকে তার সাথে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেখানে তিনি ও তার পিতা

কিছু নির্মাণকাজের ঠিকাদারি লাভ করেছেন। আমাকে দাদিমার সাথে রেখে যাওয়া হয়। আমার জীবনের প্রথম কয়েক বছর তিনিই ছিলেন আমার একমাত্র সঙ্গী ও বন্ধু। পরে আমি আবিষ্কার করেছি, তার নাম লক্ষ্মী বাই। আমরা তাকে ডাকতাম 'ভাবিজি'। দাদিমার মতো আমার মায়েরও হিন্দু-মহারাষ্ট্রীয় নাম ছিল বীরান বাই। শিশুরা তাকে জানত 'বেবেজি' হিসেবে।

হাদালিতে শৈশবের বছরগুলো সম্পর্কে আমার স্মৃতি ঝাপসা। গ্রামটিতে প্রায় তিন শ পরিবার বাস করত, যাদের অধিকাংশই বালুচ গোত্রভুক্ত মুসলিম। তারা বিপুলাকৃতির মানুষ। পুরুষদের অধিকাংশই ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি করত অথবা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। ভাইসরয়ের দেহরক্ষীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল হাদালির। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত হাদালি রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার অফিসের পাশে একটি মার্বেলফলকে উৎকীর্ণ ছিল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অন্য যেকোনো গ্রামের চাইতে অধিকসংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করেছে হাদালি। প্রায় পঞ্চাশটি হিন্দু ও শিখ পরিবার নিয়োজিত ছিল ব্যবসা, দোকানদারি ও মহাজনি কারবারে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আমি শুধু আমার দাদাজির পিতা ইন্দর সিং এবং তার পিতা পিয়ারে লাল শিখধর্ম গ্রহণ করে সোহেল সিং নাম ধারণ করেছিলেন। তারা ব্যবসা করতেন। তাদের উটের বহর খেওড়ার লবণখনি থেকে পাথুরে লবণ বয়ে আনত এবং আমাদের মরু গ্রামের একমাত্র ফল ছিল খেজুর, যা বিক্রি করা হতো লাহোর ও অমৃতসরে। সেখান থেকে তারা কাপড়, কেরোসিন তেল, চা, চিনি, মসলা ও অন্যান্য পণ্য নিয়ে আসত আশপাশের শহর ও গ্রামগুলোতে বিক্রির জন্য। পরবর্তী সময়ে আমার দাদাজি ও বাবা নির্মাণ ব্যবসা শুরু করেন। তারা কালকা-সিমলা লাইনে স্মল-গেজ রেলপথ ও টানেল নির্মাণ করেন।

হাদালিতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার ছিল আমাদের। বিশাল আঙিনাসহ বিরাট পাকা ও মাটিনির্মিত বাড়িতে বাস করতাম আমরা, যার সঙ্গে যুক্ত ছিল মহিষ রাখার ছাউনি। নিজস্ব একটি কূপও ছিল আমাদের। প্রবেশপথটি ছিল বিরাট একটি কাঠের দরজা এবং খুব কম সময়েই তা খোলা হতো। দরজার মধ্যে ছোট্ট একটি পার্শ্বদরজা ছিল, যেখান দিয়ে লোকজন প্রবেশ করত। বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ আমাদের কেরানি হিসেবে কাজ করত এবং ভাড়া করা মুসলিম উটচালকেরা আমাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাজারে বাজারে যেত। বহু মুসলিম পরিবার আমাদের ঋণগ্রহীতা ছিল।

আমাদের পারিবারিক সমৃদ্ধি জড়িত ছিল একটি কাহিনির সাথে। বলা হতো যে এক বছর লবণখনি এলাকায় প্রচুর বর্ষণ হয়। বন্যায় প্লাবিত হয়ে

যায় লবণ উপত্যকা। প্লাবনের সঙ্গে ভেসে আসেন শাইদা পির নামে এক মুসলিম পবিত্র ব্যক্তি, যিনি তার কুঁড়েঘরের খড়ের ছাউনিতে বসে ছিলেন। যখন তিনি হাদালিতে উপনীত হন, তখন তার পরনে একটি লেংটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমার দাদা সুজন সিং তাকে পরিধানের জন্য বস্ত্র প্রদান করেন, মুসলিম গোরস্থানের কাছে একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করে দেন এবং তার জন্য খাবার প্রেরণ করেন। শাইদা পির তাকে আশীর্বাদ করেন, 'আমি তোমার দুই পুত্রকে দিল্লি ও লাহোরের চাবি প্রদান করব। তারা সমৃদ্ধি লাভ করবে।' এবং তারা সমৃদ্ধি লাভ করেন। আমার পিতা দিল্লির বিভিন্ন ইমারত নির্মাণের ঠিকাদার হিসেবে এবং তার ছোট ভাই উজ্জ্বল সিং বিভাগ-পূর্ব পাঞ্জাবের বৃহত্তম ভূমিমালিক হিসেবে। পরবর্তী সময়ে তিনি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতের স্বাধীনতার পর তিনি পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হন। আরো পরে তিনি পাঞ্জাবের গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তামিলনাড়ুর গভর্নর হিসেবে তিনি তার রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত করেন।

আমরা হাদালির শিখ ও হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে কিছুটা গুমট হলেও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতাম। যদিও তাদের প্রবীণদের আমরা চাচা ও চাচি বলে ডাকতাম এবং তারাও আমাদের প্রবীণদের সেভাবে সম্বোধন করত, তবু আমরা বিয়ে বা মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া খুব কম সময়েই পরস্পরের বাড়িতে যেতাম। আমরা মুসলমানদের সম্পর্কে খানিকটা বিচলিত হয়ে থাকতাম, কারণ, আমাদের চাইতে তারা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং আকৃতিতেও অনেক বড় ছিল। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল—ওয়াদহাল, মাস্তিয়াল, আওয়ান, জানজুয়া, নুন ও তিওয়ানা এবং প্রায়ই তারা জমিসংক্রান্ত মামলায় জড়িত থাকত। যখন তখন তারা খুনোখুনি করত। তাদের থেকে আমার নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতাম।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে তাদের পুরুষ লোকগুলোর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার কথা এখনো আমার মনে আছে। তাদের অধিকাংশের উচ্চতা ছয় ফুটের অধিক এবং চাবুকের মতো চকচকে পেটানো শরীর। তাদের কানের পেছনে তেলমাখা কোঁকড়ানো চুল ঝুলে থাকত এবং চুলে গোঁজা থাকত কাঠ বা হাতির দাঁতের ছোট্ট চিরুনি। লোকগুলো ভেড়া বা উটের লোম থেকে চরকায় সুতা কাটত কিংবা তাদের ঝুঁটিধারী বাজ নিয়ে শিকারে বের হতো। তাদের মহিলারাও দীর্ঘাঙ্গী, একহারা গড়নের এবং সুগঠিত দেহের অধিকারী। তারা মাথায় দুটি পানিভর্তি কলসি বহন করতে পারত, ডান কাঁখে অতিরিক্ত আরেকটি কলসিও বহন করত। তাদের রেশমি জামা এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত সালোয়ারে পানি ছলকে পড়ত কলসি থেকে। এর ফলে জামা

সিক্ত হয়ে তাদের কালো সুদৃঢ় বোঁটাসমৃদ্ধ সুডৌল স্তনের রেখা এবং পেশিবহুল টোল পড়া নিতম্বও পরিস্ফুট হয়ে উঠত। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা কখনো মাটির দিকে নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টি তুলত না। কারণ, তারা সচেতন ছিল যে পুরুষদের দৃষ্টি তাদের গিলে খাচ্ছে। চার বছর বয়সেই এসব যৌন বিষয়ে আমার মধ্যে সীমাহীন আগ্রহ ছিল।

হাদালিতে তেমন উপভোগ্য বা উত্তেজনাকর কিছু ঘটেনি। একধরনের অলস সময়সূচির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো জীবন। আমার দাদিমা ভোরের বেশ আগে উঠে মহিষগুলো দোহন এবং গোবরের ঘুঁটের আগুনের ওপর বসানো একটি মাটির হাঁড়িতে দুধ ঢালতেন। এরপর প্রতিবেশী মহিলাদের সাথে খোলা মাঠে চলে যেতেন পায়খানা করতে। কুয়া থেকে কয়েক বালতি পানি তুলে তারার আলোতে স্নান করতেন সকালের প্রার্থনা 'জাপজি' জপতে জপতে। পরবর্তী আধা ঘণ্টা তিনি ব্যয় করতেন মাখন ও ঘি তৈরির জন্য দুধ জ্বাল দিতে। কাজ করতে করতে তিনি প্রার্থনা অব্যাহত রাখতেন। এরপর তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগাতেন। আমাকে ছাদের ওপরই মল ত্যাগ করতে দেওয়া হতো, যেখানে প্রখর সূর্যতাপে সবকিছু যেন জ্বলত। আমি পরিচ্ছন্ন হয়ে এলে তিনি আমার দীর্ঘ চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দিতেন। শিখ হওয়ার কারণে আমরা কখনো চুল কাটতাম না। আমি হলুদ মাটিমাখা কাঠের প্লেট, নলখাগড়া দিয়ে তৈরি কলম ও মাটির দোয়াত বের করতাম। আগের রাতে বেঁচে যাওয়া বেশ কিছু বাসি রুটি তিনি ওড়নায় পেঁচিয়ে নিতেন। আমরা ধর্মশালা-কাম-স্কুলের উদ্দেশ্যে বের হতাম। গ্রামের বেওয়ারিশ কুকুরগুলো আমাদের জন্য দরজার বাইরে অপেক্ষায় থাকত। আমরা একটি একটি করে রুটি টুকরো করে কুকুরগুলোর দিকে ছুড়ে দিতাম। ফেরার পথে বিতরণের উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি রুটি রেখে দিতাম।

আমাদের বাড়ি থেকে ধর্মশালার দূরত্ব বেশি নয়। আমাকে ভাই হরি সিংয়ের হাতে তুলে দেওয়া হতো, যিনি একই সাথে গ্রন্থী (শিখদের পবিত্র গ্রন্থ পাঠকারী) এবং শিক্ষক। আমি অন্য হিন্দু ও শিখ ছেলেদের সাথে ফ্লোরে বসে কোরাস তুলে নামতা পড়তাম। দাদিমা বড় হলঘরটিতে যেতেন, যেখানে একটি অনুচ্চ টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজানো ছিল তিনটি 'গ্রন্থ সাহিব'। টেবিলের নিচে প্রার্থনাকারীদের ফেলে যাওয়া বেশ কিছুসংখ্যক চশমা, যাতে যাদের চোখে লাগে, তারা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। নামতা পড়ানো শেষ হলে ভাই হরি সিং আমাদের লেখা শেখানোর জন্য একটি বোর্ডে গুরমুখী অক্ষর লিখতেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও তার মেজাজ ছিল তিরিক্ষি। আমাদের স্লেটে কোনো ভুল দেখলে পুরস্কার জুটত আমাদের পশ্চাদ্দেশে তার

লাথি। তবে রক্ষা ছিল যে এই পাঠ গ্রহণ এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হতো না। দাদিমা এবং আমি বাড়ির পথ ধরতাম কুকুরগুলোকে রুটির টুকরা দিতে দিতে। তিনি যখন মেঝে ঝাড় দিতে, বিছানা গুটিয়ে রাখতে এবং দুপুরে খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, আমি তখন 'গোল্লাছুট' অথবা 'গুলি ডান্ডা' খেলার জন্য বের হয়ে যেতাম।

বিকেলে আমরা যা করতাম, তা নির্ভর করত বছরের বিভিন্ন সময়ের ওপর। মরুভূমির শীতকাল খুব শীতল হতে পারে এবং দিনগুলো থাকে খুব ছোট। করার মতো কাজ বহু, অথচ কাজ করার জন্য সময় পাওয়া যায় খুব কম। কিন্তু আসল শীত টিকে থাকে বেশি হলে দিন চল্লিশেক। সংক্ষিপ্ত বসন্তকালের পর শুরু হয় সুদীর্ঘ গ্রীষ্মকাল। প্রতিদিন বাড়তে থাকে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা এবং একপর্যায়ে তা ১২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উঠে যায়। বৃষ্টিপাত দুর্লভ ব্যাপার। আমাদের পুকুর ও জলাশয়গুলো পূর্ণ হয়ে যায় লবণখনি এলাকা থেকে বন্যার সময়ে আসা পানিতে। কিছু পানি স্থান করে নেয় কুয়ায়। এসব কুয়ার মধ্যে খুব স্বল্পসংখ্যক, যেগুলো ইট ও সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা, কেবল সেগুলোর পানিই মানুষের পানের উপযোগী থাকে।

বৃষ্টির পানি জমে থাকা কুয়াগুলোকে পুং লিঙ্গের উল্লেখে বলা হতো 'খারা খুও' আর সুপেয় পানির উৎস হিসেবে বিবেচিত কুয়াগুলোকে স্ত্রী লিঙ্গ বিবেচনায় বলা হতো 'মিট্টি খুও'। আমাদের অধিকাংশ দাঁত ছিল হলদেটে এবং ওপরের পাটিতে আড়াআড়ি ছিল একটি বাদামি দাগ। পানের অযোগ্য পানি পান করার ফলেই এমনটি হয়েছিল। বছরের যে সময়ই হোক না কেন, আমার দাদিমা প্রতি বিকেলে গুরু অর্জুনের শান্তির শ্লোক 'সুখমণি' আওড়ে চরকা কাটতেন। দাদিমার সাথে আমার স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে চরকার শব্দ ও প্রার্থনার বিড়বিড় ধ্বনি।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ মাসগুলো ছিল যন্ত্রণার মতো। উত্তপ্ত বালিতে মানুষের পায়ের তলা জ্বলে যেত। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে আমরা দেয়াল ঘেঁষে দেয়ালের ছায়ায় হাঁটতাম। শিশুরা মল ত্যাগ করার জন্য শীতলতম স্থান বেছে নিত বলে মলের স্তূপ এড়িয়ে পা ফেলতে হতো। দিনের বেলায় আমরা ঘরের মধ্যেই গল্পগুজব করে অথবা ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে মাছি তাড়িয়ে কাটাতাম। শেষ বিকেল মহিষ ও উটগুলোকে পানি পান করানোর জন্য নেওয়া হতো পুকুরে। বদ্ধ পানিতে মহিষ আনন্দে শরীর ডুবিয়ে রাখত। ছেলেরা মহিষের পিঠের ওপর থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ত। সূর্যাস্তের সময় গরু-মহিষগুলো ফিরিয়ে নেওয়া হতো বাড়ির দিকে। মহিষ আবার দোহানো হতো এবং চুল্লিতে আগুন জ্বলত। পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত ঘুঁটে জ্বালানো ও

রুটি সেঁকার গন্ধ। ছেলেরা দল বেঁধে বালিরাশির দিকে চলে যেত মল ত্যাগ করতে। আমরা যখন মলত্যাগে ব্যস্ত, তখন গুবরে পোকা আমাদের মলকে মার্বেলের আকৃতি করে বালির মধ্যে তাদের গর্তের দিকে গড়িয়ে নিয়ে যেত। পশ্চাদ্দেশ পরিচ্ছন্ন করার অদ্ভুত পদ্ধতি ছিল আমাদের। আমরা এক সারিতে বসতাম বালির ওপর আমাদের নগ্ন পশ্চাদ্দেশ স্থাপন করে। একজনের দেওয়া নির্দিষ্ট সংকেত পাওয়ামাত্র পা দুটো উঁচু করে হাত দিয়ে বইঠার মতো বালি ঠেলে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটতাম। প্রতিযোগিতা যখন শেষ হতো, তখন আমাদের পশ্চাদ্দেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বালিতে পূর্ণ। পরে রাতের বেলায় এবং চাঁদ ওঠার প্রথম লগ্নগুলোতে আমরা কানামাছি খেলতাম। বালির মধ্যে পূর্ণিমার রাতগুলো আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। রাতের খাবার খেতে তলব করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা একে অন্যকে তাড়া করে ফিরতাম। একটি হুমকিতে কাজ হতো যে আমরা ডাকাতদের দ্বারা অপহৃত হতে পারি। আমরা কুখ্যাত ডাকাত তোরা ও সুলতানার নামের সাথে পরিচিত ছিলাম, যারা হত্যাকাণ্ড ও অপহরণের ঘটনা ঘটিয়ে গ্রামে গ্রামে ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ডাকাতের ভয় ছাড়াও আমাদের আরেকটি বড় ভয় ছিল ধূলিঝড়ের। ধূলি ওড়া এবং ধূলির ঘূর্ণির সাথে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলাম আমরা। কিন্তু 'ঝক্কর' বা ধূলিঝড় ছিল ব্যতিক্রমী ধরনের। ঝড়ের অন্ধ উন্মত্ততায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো যে আমাদের নাক, চোখ ও কানের মধ্যে বালি প্রবেশ রোধ করার জন্য মাটি আঁকড়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রাখা ছাড়া সামান্যই করণীয় থাকত। কখনো এমনও হয়েছে, ঝড়ে এত বালি উড়েছে যে বালির নিচে ডুবে গেছে রেললাইন এবং বালি সরিয়ে না ফেলা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করতে পারেনি। কিন্তু এর ফলে মাছি ও পোকামাকড়ের পালও অপসারিত হয়েছে এবং পরবর্তী কয়েক দিন বাতাস থাকত নির্মল ও শীতল।

রাতের খাবারের পর ঘুমানোর জন্য আমরা ছাদে উঠে যেতাম। দাদিমা ইতিমধ্যে তার সান্ধ্য প্রার্থনা, দিনের শেষ প্রার্থনা 'কীর্তন সোহিলা' আউড়ে ফেলতেন। তিনি আমার পিঠে জমাট বাঁধা ক্রিম মাখতেন। তার আলতো মালিশে যদি আমার ঘুম না আসত, তাহলে তিনি আমাকে গুরুদের জীবন থেকে কাহিনি শোনাতেন। এরপরও যদি আমি জেগে থাকতাম, তাহলে তিনি আকাশের তারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে বকুনি দিতেন : 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না এখন কত রাত। এখন চুপ করো।'

গ্রীষ্মের সবচাইতে সুন্দর সময় প্রথম সকাল। মরুভূমির ওপর দিয়ে তখন বয়ে যায় শীতল বাতাস। সে বাতাস বয়ে নেয় আমাদের বাগানের গোলাপ ও বেলি ফুলের সুবাস। তখন অর্ধঘুম ও কল্পরাজ্যে বিচরণের সময়।

অতি সংক্ষিপ্ত ক্ষণ। উত্তপ্ত সূর্য ওপরে উঠতে থাকে। মাছির আগমন এবং কাকের বেসুরো কা কা ডাক শুরু হয়। স্বর্গীয় এই অর্ধঘণ্টাকে উর্দু কবিরা বর্ণনা করেছেন 'বা'দ-ই-নাসিম'—প্রত্যুষের মৃদুমন্দ বায়ু—যার সমাপ্তি ঘটে সহসা।

আমাদের নিয়মিত দৈনিক সময়সূচির ব্যতিক্রমী ঘটনা হাদালিতে সামান্যই ঘটে। দু-এক বছর অন্তর একটি বা দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যেহেতু খুনের ঘটনা মুসলমানরে মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অতএব, এ নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। প্রতিবছর রেলস্টেশনের কাছে খোলা মাঠে তাঁবু ভেদ করার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীরা অশ্বপৃষ্ঠে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সংকেত দেওয়ামাত্র বর্শা উঁচিয়ে এবং 'আল্লাহ বেলি হো', অর্থাৎ 'আল্লাহ আমার সেরা বন্ধু' আওয়াজ তুলে লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হয়। লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার পর তারা বর্শা উঁচু করে তুলে ধরে, যাতে দর্শকেরা সবাই দেখতে পায়। তারা প্রায়ই অতিক্রান্ত ট্রেনের সাথে পাল্লা দেয় এবং তাদের ঘোড়ার দম না ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘোড়া থামায় না। হাদালিতে একজন শিখ যখন প্রথম সাইকেল আনে, সে ঘটনা আমার মনে আছে। সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে যে তার সাইকেল যেকোনো ঘোড়ার চাইতে আগে যেতে পারবে। কোনো অশ্বচালক তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পূর্বে আমরা ছেলেরাই তাকে দেখে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। হাদালিতে কোনো পাকা রাস্তা ছিল না এবং সাইকেলচালক তখনো ততটা চৌকস হয়ে উঠতে পারেনি। সাইকেলের চাকা বালিতে আটকে যাওয়ায় তার পক্ষে দক্ষতা দেখানো হয়ে উঠছিল না। ফলে সে গ্রামবাসীদের হাসির পাত্রে পরিণত হলো এবং এর পর থেকে তাকে 'সাইকল বাহাদুর' বলে বিদ্রূপ করা হতে লাগল।

দিল্লিতে চলে যাওয়ার পর আমি তিনবার হাদালিতে ফিরে গিয়েছিলাম। প্রথমবার 'গ্রন্থ সাহিব' পাঠ শুরু করার জন্য। আমার বড় ভাই, সম্পর্কিত এক ভাই এবং আমাকে সমবেত শিখ জনমণ্ডলীর সামনে উচ্চ শব্দে 'জাপজি' পাঠ করতে হলো এবং শপথ নিতে বলা হলো যে প্রতিদিন আমরা অন্তত একটি শ্লোক উচ্চারণ করব। আমাদের কেউই দীর্ঘদিন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি। লাহোরে আইন পেশায় যোগ দেওয়ার পর একবার হাদালিতে গিয়েছিলাম। এক বন্ধুর সাথে গাড়ি চালিয়ে সেখানে যাই, যার এক ভাই লবণখনির ম্যানেজার ছিলেন। রেলস্টেশনের কাছে গাড়ি থামানোর পর আমার চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। হাঁটু গেড়ে বসে মাটি চুম্বন করার তাগিদ আমি কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছি। আমি হেঁটে ধর্মশালা এবং যে বাড়িতে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, সেখানে যাই। ভাইসরয়ের দেহরক্ষীদের

রিসালদার ছিল, এমন একজন লোক আমাকে চিনতে পেরে সারা গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে দেয়। আমি যখন গ্রাম ত্যাগ করি, সে সময়ের মধ্যে আমাকে বিদায় জানাতে বিরাট জনতার ভিড় জমে উঠেছিল।

১৯৮৭ সালের শীতকালে আমি শেষবার হাদালি সফর করি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ঘটনা গ্রামটির জনসংখ্যার মধ্যে পুরোপুরি পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। হাদালিতে একজন হিন্দু বা শিখও আর ছিল না। হরিয়ানা থেকে পাকিস্তানে গমনকারী কিছু মুসলিম উদ্বাস্তু দখল করেছে আমাদের বাড়ি। বাড়িটি সমান তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। রোহতাক থেকে যাওয়া তিনটি মুসলিম পরিবার তিন অংশে বাস করছে। নতুন প্রজন্মের হাদালিবাসী, যারা কখনো কোনো শিখকে দেখেনি, তাদের বয়সই চল্লিশের ওপরে। তারা কীভাবে আমাকে স্বাগত জানাবে, সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অনিশ্চিত। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর বন্দী হিসেবে ঢাকার এক যুদ্ধবন্দী শিবিরে কিছুসংখ্যক আটক পাকিস্তানি তরুণ সৈনিকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমেই এই প্রজন্মের হাদালিবাসীর সাথে আমার যোগসূত্রের সৃষ্টি। আমি তাদের খুঁজে বের করে তাদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম যে তারা নিরাপদ এবং সুস্থ আছে। আমি লাহোর থেকে রওনা হয়ে পড়ন্ত বিকেলে হাদালিতে পৌঁছাই। গ্রামের প্রবীণেরা রাস্তার পাশে উর্দুতে 'খোশ আমদেদ' লেখা ব্যানার এবং সোনালি ও রুপালি রঙের মালা হাতে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি যাদের সাথে হাত মেলালাম, তাদের কাউকে আমি চিনতে পারিনি। আমাকে হাইস্কুল মাঠে একটি মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো, যার ওপরে উড়ছিল একটি পাকিস্তানি পতাকা। দুই সহস্রাধিক হাদালিবাসী চেয়ারে ও মাটিতে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে। ভাঙা উর্দুতে আমাকে হাদালির পুত্র হিসেবে প্রশংসা করে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছিল। আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। সহসা অনুভব করলাম যে আমি নিজেকে আহাম্মক বানিয়ে ফেলেছি। আসলেও তাই। ভালোভাবেই শুরু করেছিলাম আমি। গ্রামের উচ্চারণে আমি কথা বললাম। আমি বললাম যে তারা ঠিক যেভাবে মক্কা ও মদিনার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় থাকে, ঠিক তেমনই আমার জীবনের 'মাগরিব'-এর সময় হাদালিতে ফিরে আসার ঘটনা আমার জন্য হজ ও ওমরাহর মতো। মহানবী যেমন বিজয়ী হিসেবে মক্কায় ফিরে তার প্রথম রাতে মক্কার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন এবং তার প্রথম স্ত্রীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছেন, ঠিক তেমনই হাদালির গলিতে গলিতে আমাকে একা ঘোরার জন্য ছেড়ে দিলে এবং যে বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছে, সে বাড়ির চৌকাঠে মাথা রেখে বিশ্রামের সুযোগ দিলে আমি তার চাইতে আর কোনো কিছুই বেশি পছন্দ